বাগানের শহর থেকে রিকশার শহর

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা হচ্ছে গরিবের শহর অথচ, ঢাকার কর্তৃত্ব কখনো গরিবের হাতে থাকেনি। ঢাকা গরিবের শ্রমে বিকশিত, কিন্তু শ
াহরিক, নাগরিক সবরকমের সুযোগ, সুবিধা থেকে গরিবরা বঞ্চিত।১ এ - অবস্থা যেমন সপ্তদশ শতকে ছিল, এখন একুশ
শতকেও আছে। ভবিষ্যতেও সে - অবস্থা বদলাাবে কিনা সন্দেহ। এলিটদের সঙ্গে গরিবের এই টানাপোড়েন বা রণজিৎ
গুহের ভাষায় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব, ঢাকাকে নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র দেয়নি। বরং উচ্চবর্গের লোভ ও দখল - ম
ানসিকতা, ঢাকার যা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল তা নিশ্চিহ্ন করেছে। আজকের ঢাকা, তার পরিকল্পনা, স্থাপত্য সবকিছুই এর প্রম
াণ।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় তাঁর প্রতিনিধি ইসলাম খান ১৬১০ সালে মুঘল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার পত্তন
করেন।২ পত্তন শব্দটি হয়তো সঠিক হলো না, কারণ, ১৬১০ সালের আগেও ঢাকার অস্তিত্ব ছিল। তবে, সে - সময় ঢাকা
প্রথম রাজধানীর মর্যাদা পায়। পরবর্তীকালে, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমলে বঙ্গভঙ্গের সময়, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অ
ামলে, ১৯৭১ সালে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায় ঢাকা। আর কোনো শহর সম্পর্কে একথা বল
া যাবে না। একটি বিষয় লক্ষণীয়, যখনই ঢাকা মর্যাদা পেয়েছে রাজধানীর, তখনই এর আয়তন বেড়েছে, স্বাভাবিকভাবেই
শহরটি সমৃদ্ধ হয়েছে, রাজধানী স্থানান্তরিত হলে নিষ্প্রভ হয়েছে খানিকটা। কিন্তু, ঢাকার বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজধানী না থ
াকাকালীন অবস্থায় তা একেবারে নিভে যায়নি, যা ঘটেছে অন্যান্য অনেক শহরের ক্ষেত্রে। ঢাকা টিকে ছিল এবং টিকে ছিল
তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের কেন্দ্র হিসেবে, যা এখনো পরিবর্তিত হয়নি।

ঢাকা শহরের বিন্যাস সবসময়ে একই রকম ছিল না। শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি তা প্রভাবিত করেছে, দষ্টিভঙ্গিতে কখনো কখনো
কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না।

অধ্যাপক আবদুল করিম, সপ্তদশ শতকে মুঘল ঢাকার বিকাশের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মুঘল শাসন
ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে, বাঙালি (অবাঙালিও) পেশাজীবীদের বসতিস্থাপন ও বিদেশী বণিকদের ঢাকা আগমন ঢাকার
বিকাশের জন্য দায়ী। তিনি আরো লিখেছেন, বর্তমান বাবুবাজার এবং সদরঘাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল আদি ঢাকা।
মুঘল থানা ঢাকায় স্থানান্তরের পর ঢাকা শহরের পত্তন হয় এবং ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন
করলে শহরের বিকাশ শু হয়। এরপর বৃত্তিজীবীরাবিভিন্ন স্থানে বসবাস শু করে। বৃত্তি - অনুযায়ী তারা একেকজায়গায়
বসতি স্থাপন করেছিল, যেমন, শাখারি বাজার, পাটুয়াটুলি বা তাঁতিবাজার। মুঘল প্রসাসনের জন্যে শহর পশ্চিমে বাংলাব
াজারের পর এবং পূর্বে পেশাজীবীদের কারণে বিস্তৃতি হতে থাকে। ইউরোপীয়রা প্রথমে তেজগাঁয় বসতি স্থাপন করে এবং
এভাবে শহরের বিকাশ শু হয়। বিভিন্ন সুবাদারের সময় বিভিন্ন এলাকা গড়ে ওঠে, ব্যবসা - বাণজ্য বৃদ্ধি পায়। বলা যেতে
পারে, ঢাকা একটি সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত হয়।৩ এক গবেষকের হিসাবে সে - আমলের বিশটি সেরা শহরে মধ্যে ঢাক
া ছিল একটি।৪ ঢাকার এই সমৃদ্ধির কারণ শুধু প্রশাসনিক নয়, এর প্রধান কারণ, ঢাকা ছিল উৎপাদনেরও কেন্দ্র।

শহর বিকাশের জন্যে মানুষের প্রয়োজন। রাজধানী হওয়ার পর মুঘল বা বিদেশীদের সংখ্যা এমন ছিল না, যাতে শহর
বিকশিত হতে পারে। কর্তৃত্ব ছিল মুঘলদের এবং নিজেদের হয়তো তারা বহিরাগতও ভাবেনি। সে কারনে তারা শহরের

বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছে, যাদের একটা বড় অংশ ছিল বহিরাগত। সে - আমলে লোকসংখ্যার সঠিক হিসাব অবশ্য জানা যায়নি। টেইলর এক হিসাবে জানিয়েছেন, ১৭০০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল নয় লাখ। এর সংখ্যা সঠিক বলে মেনে নেওয়ার কারণ নেই। কারণ, ১৯৫১ সালে ও ঢাকার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লাখের বেশি ছিল না।৫ মুঘল আমলে যদি এক বা দুইলাখ লোকও থাকে শহরটিতে, তাহলেও সে - সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। মুঘলর া মানুষকে বসতিস্থাপনে, উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্যে সম্পত্তি দান করেছিল,যাকে বলা হতো লাখেরাজ সম্পত্তি। বস্তুত, বলা যেতে পারে, লাখেরাজ সম্পত্তির জমির ওপরই গড়ে উঠেছিল ঢাকা শহর।৬ লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল নিষ্কর। এরকম ঘটনা পরবর্তীকালে ঘটেনি।

জমি থাকা আর রোজগার এক নয়। ওই সময়ে শায়েস্তা খাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল আটত্রিশ কোটি টাকা। দৈনিক আয় দুইলাখ, ব্যয় এক লাখ। কিন্তু, অন্যদিকে যার উৎপাদনের সঙ্গে যুত্ত ছিলেন তাদের আয় ছিল কেমন? সবচেয়ে দামি উৎপ াদিত পণ্য ছিল মসলিন, যা দিল্লি পাঠানো হতো সম্রাটের জন্যে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন ৎমলবুস খাস' যেত সম্রাটের জন্য। আড়াইশো টাকা ছিল প্রতি টুকরোর দাম। সম্রাট ঠিক আড়াইশো টাকাই দিতেন। সম্রাটের কর্মচারী তাঁতিকে দিতেন দেড়শো টাকা। এদিকে তিনজন তাঁতির একবছর লাগত একখণ্ড মলবুস খাস তৈরি করতে। খরচ বাদ দিয়ে টাকা থেকে যা থাকত তা প্রথম অংশ নিয়ে যেতেন প্রধান তাঁতি। বাকিটা পেতেন তার সহকারীরা। মসলিন শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে লোক যুত্ত ছিলেন। কার্পাস উৎপাদন থেকে। তাঁতি, রিফুকার, ধোপা, নারদিয়া, সূক্ষ্ম সুঁচের কাজ করার কারিগর -- তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হতো। একজন সুতা কাটুনি ধলপ্রহর থেকে বেলা নয়টা এবং বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুত া কাটত। সারামাস সুতা কাটলে আড়াই টাকার বেশি রোজগার সম্ভব ছিল না। সাধারণ তাঁতির মাসিক বেতন এক থেকে ছিল দেড় টাকা পর্যন্ত। ১৮০০ সালে আয় ছিল যথাত্রমে দুই থেকে তিন এবং এক থেকে দুই টাকা পর্যন্ত। মুঘল আমলে প্রধান তাঁতির (যিনি কারিগর দিয়ে কাজ করতেন) আয় মাসিক আট টাকার বেশি ছিল না।৭ অন্য পেশাজীবী, যেমন,কুমে ার বা শঙ্খকারের রোজগারও এরচেয়ে বেশি ছিল না। ইংরেজ আমলের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, অষ্টাদশ শতকে একজন ধোপার আয় ছিল চার টাকা, নাপিত আড়াই টাকা আর জমাদার এক টাকা। শায়েস্তা খাঁর কথা বাদ দিই, আ মির - ওমরাহদের কথা বাদ দিই, মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে যিনি জড়িত ছিলেন তার সঙ্গে একজন বাঙালি বা উৎপাদকের অ ায়ের কোনো তুলনা সম্ভব নয়। সুতরাং, যখন আমরা বলি শহর সমৃদ্ধ, তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সমৃদ্ধ। যেমন, মাথা পিছু গড় আয়ের হিসাব। এ - হিসাব দিয়ে মানুষের অবস্থা নির্ণয় করা যায় না।

রোজগার ছাড়াও ঢাকা শহরের বিন্যাসে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য ছিল। অনেকে বলেন ঔপনিবেশিক আমলেই তার সৃষ্টি। এ - মন্তব্য বোধহয় ঠিক নয়। মুঘল আমলে শাসকেরা বা ক্ষমতার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা থাকতেন সুজাতনগর, ওমরাহপুর (নওয়াবপুর) বা বখশিবাজারে। পেশাজীবী বা সাধারণ মানুষরা গাদাগা দি করে থাকতেন পুরনো এলাকায়।লক্ষণীয় এলিটরা সবসময়ে এমন জায়গা বেছে নেয়, যা সাধারণ থেকে দূরে এবং খে ালামেলা। অর্থাৎ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ আলাদা। মুঘলরা সামগ্রিকভাবে, শহরের সৌন্দর্য বিকাশ ও পরিবেশ রক্ষার্থে মনে াযোগী ছিল। তারা যেখানে গেছে সেখানেই পানি সরবহাহ, পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থা করেছে এবং বাগান করেছে। এসব ব্যবস্থা পরিবেশ নির্মল করেছে বটে। তবে, এইসব ব্যগানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল বলে জানা যায়নি। অনুমান করে নিতে পারি, তা ছিল তাদের এবং তাদের নর্তকী বা প্রিয়জনদের উপভোগের জন্য। সেইসব বাগান থেকে ঢাকা খ্যাতি পেয়েছিল বাগানের শহর হিসেবে।

।।দুই ।।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ঢাকার ক্ষয় শু হয়। এবং শহরের পরিধিও ত্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। মুঘল আমলে শহরের পরিধি মিরপুর ধরলেও আসলে সুজাতনগর বা রমনার পর ছিল বাগান, বিচরণ অঞ্চল, জঙ্গল, ছোটছোট বসতি প্রভৃতি। কোম্পানি আমল থেকেই ঢাকা দ্রুত জঙ্গলময়, অস্বাস্থ্যকর একটি শহরে পরিণত হয়। গরিবদের সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপ হেবার তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছিলেন

"ঢাকা এখন প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ। এর বাণিজ্য যা ছিল, তা' থেকে ষাট ভাগ কমে গেছে, আর চমৎকার সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ জাহাঙ্গীরের দুর্গ, তাঁর তৈরি মসজিদ, এর প্রাচীন নবাবদের রাজপ্রাসাদসমূহ, ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদেরফ্যাক্টরি ও চার্চ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঙ্গলে গেছে ঢেকে।

ঢাকার হিন্দু এবং মুসলমান জনসংখ্যা, ৩,০০,০০০ এবং এ সংখ্যা বোধহয় মোটামুটি ঠিক। এখানে নব্বই হাজারের ওপর গৃহ এবং কুটির আছে।" শহরের বর্ণনা দিয়েছেন হেবার ভোবে ৮ --- "পুরনো ঢাকা কলকাতার চিৎপুরের মতো ব াজে, কিন্তু আশপাশেকিছু সুন্দর ধ্বংসাবশেষ আছে। তবে ধ্বংসাবশেষগুলিকে ঘিরে আছে ছোট ছোট নোংরা কুটির। ইটের তৈরি একটি দুর্গ নজরে পড়ল যা ব্যবহৃত হতো প্রাসাদ হিসেবে। এর স্থাপত্য মস্কোর ক্রেমলিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ... ঢাকার তিন - চতুর্থাংশ বাসিন্দাই মুসলমান এবং তাদের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িরই সদরে আরবি বা ফার্সী ভাষায় লেখা ফলক আছে। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িই জীর্ণ। কিন্তু খুব একটা পুরনো নয়। কলকাতার তুলনায় এখানকার ইউরে াপীয়দের বাড়িগুলো ছোটখাটো, জীর্ণ। আর বাড়িগুলো শহরের বাইরে হওয়ায় জঙ্গলে ঢাকা, ফলে সেখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। যতদুর গেলাম ততদূর কোনো ফসলের ক্ষেত নজরে পড়লো না, খালি এক জায়গায় দেখলাম সামরিক বা হিনীর জন্যে কুড়ি একর জমি পরিষ্কার করা হয়েছে।"

১৮৩৭ সালে ঢাকার কমিশনার কর্তৃক বোর্ডকে প্রেরিত এক চিঠিতে জানা যায়, ঢাকার আরো অবনতি হচ্ছে।৯ বোর্ডকে জানানো হয় যে -- গত পঁচিশ বছরে শুধুমাত্র সম্পদগত দিক ধরলেও ঢাকার ক্ষয় হচ্ছে। এর প্রধান কারণ কমিশনারের মতে, মসলিন উৎপাদনকারীদের বিলুপ্তি। এছাড়া আরো দুটি কারণ আছে, তা হলো সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের দারিদ্র্য এবং কোর্ট অব অ্যাপিলের বিলুপ্তি।

একই চিঠির সূত্র ধরে কমিশনার জানান যে, যেখানে ১৮১৭ সালে চৌকিদারি ট্যাক্স ছিল ২১,৭৮৭ ঢাকা, ১৮৩৬ সালে তাএসে দাঁড়িয়েছে ৮৯২০ টাকায়। শুধু তাই নয়, ১৮১৭ সালে বাড়ির সংখ্যা ছিল যেখানে ২১,৬৩১ টি, ১৮৩৬ সালে সে - সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৮৮০ টিতে।১০

ঢাকা শহরের অধিকাংশ জমি ছিল লাখেরাজ, যা আগেই উল্লেখ করেছি।১১ শহরে গৃহ - ট্যাক্স ধার্য করার প্রসঙ্গ নিয়ে এ - ব্যাপারে বিতর্ক শু হয়। এই সময়ে ঢাকা শহরের বাসিন্দারা গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ডকে একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। এই আবেদনপত্র হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত ছিল, তা সত্ত্বেও শহরবাসী ও শহরের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় এ - চিঠিতে।১২

আবেদনপত্রে ঢাকাবাসীরা জানিয়েছেন যে, তারা জানতে পেরেছেন, গভর্নর জেনারেল আদেশ দিয়েছেন যে, যে - জমিতে তাদের বাড়ি তৈরি করা হয়েছে সেই জমি এবং বাড়ির জন্যে কর দিতে হবে এবং এ - আদেশ জানতে পেরে তারা অ াতঙ্কিত। তারা আরোজানিয়েছেন, অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঢাকার অবস্থান নিচুতে। দৈর্ঘ্য - প্রস্থে এই শহর চার মাইল। সীম ানা হচ্ছে ধোলইখাল থেকে সুলতানগঞ্জ এবং নদী থেকে অম্বর ব্রিজ (শাহবাগ এলাকায়)। শুধু তাই নয়, এ - শহরের বা সিন্দারা অত্যন্ত গরিব। শহরের এক - ষষ্ঠাংশ জঙ্গল, এক - চতুর্থাংশ (যা থেকে সরকার রাজস্ব পায়), বাকি এক - ষষ্ঠ াংশে বাস করছে লোকজন। প্রাচীনকালে তারা যখন জঙ্গল সাফ করেছে তখন তারা এই অধিকার (জমির) পেয়েছেন। বা ড়ি বানিয়েছেন। এবং যদি এসবের ওপর কর ধার্য করা হয়, তাহলে জীবনের জন্যে তারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। ফলে সরক ারের লাভ হবে না কিছুই। তাছাড়া, বর্তমানে ব্যবসা - বাণিজ্য নেই (অর্থাৎ বাণিজ্যে লাভ হয় না) এবং এই কর ধার্য করলে তারা প্রায় ভিক্ষুক হয়ে যাবেন। তারা আরো জানিয়েছেন, এ - অঞ্চলে দু'বিঘা থেকে বেশি জমি কারোনেই।১৩

ওই সময়ে স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর কমিশনারকে জানান যে, ঢাকার আন - কভেনেন্টড ডেপুটি কালেক্টর মি. ডিয়ারম্য ান তাঁকে জানিয়েছেন যে, শহরে ১,৪৪৯ জন লাখেরাজদার আছে, যারা নিজ জমিতে বাস করে এবং ৪১৫ জনের ৫ জনের ওপর ৪৬৮ জনের ৫ জনের নিচে ভাড়াটে আছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তখনো ঢাকা শহরের মধ্যে ৫৫০ বিঘা বাগান ও চাষযোগ্য জিমি ছিল।১৪

১৮৪০ -রে ঢাকা সম্পর্কে তৎকালীন ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেইলর বেশ সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন।১৫ তিনি লিখেছেন, "যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত, তা কেবল নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ এবং তীর বরাবর রাস্তাঘাট বাজার ও গলিপথ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় সোয়া এক মাইল বিস্তৃত।" ১৬

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ছিল ঢাকা শহরের অবস্থা। মুঘল আমলে যে - শহর ছিল সমৃদ্ধিশালী, কোম্পানির আমলে চূড়ান্তভাবে তার অবনতি ঘটে। শুধু সম্পদগত দিক থেকেই নয়, পরিধিগত দিক থেকেও। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা সরকারি আনুকূল্য তেমন লাভ করেনি। ফলে শহর হিসেবে ঢাকা অবহেলিত হয়েছে এবং কোম্পানি আমলের তুলনায় ব্রিটিশ আমলের সামগ্রিকভাবে শহরের অবয়বগত অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঢাকা শহরের পরিধি আবার বৃদ্ধি পায় ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়।

১৯০৫ - এর আগে ইংরেজরা শহরটিকে নিন্দিত শহর হিসেবেই বিবেচনা করেছে। তারা কখনো এটিকে নিজেদের শহর হিসেবে বিবেচনা করেনি, যা ছিল স্বাভাবিক। কোম্পানি, কর আদায় ছাড়া নগর - পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কখনো মনোযোগ দেয়নি। এই শহর তখন উৎপাদনের কেন্দ্রও ছিল না। ফলে, দ্রুত এর অবয়বগত সমৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। বাড়তে থাকে গরিবের সংখ্যা। দুর্ভিক্ষ, বন্যার কারণে গ্রাম থেকে মানুষ একমাত্র শহর ঢাকার দিকে এগুতে থাকে। ওই সময়ে কখনো কখনো কোনো কালেক্টর বা ম্যাডিস্ট্রেট স্ব - ইচ্ছায় কিছু জঙ্গল - আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন, শহর পরিষ্কার করার জন্যে কমিটি করেছেন। রানী ভিক্টোরিয়া শাসনভার গ্রহণের পরও অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। পৌরসভা হয়েছিল বটে, কিন্তু অর্থের অভাবে কার্যকর কিছু করতে পারেনি। ১৮২৩ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ড'স রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন রেসকোর্সের পত্তন করেছিলেন, রেসকোর্সের এককোণেএকটি টিলা সৃষ্টি করে বাংলো বানিয়েছিলেন, এসব কিছু নিজের বা সহকর্মী ইংরেজদের বিনোদনের জন্য। ঢাকা শহরে এ- সময়ে যে - পূর্তকার্য হয়েছিল, তার অধিকাংশ, যেমন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল বা কলেজ, পপোজ স্কুল, লোহার পুল তৈরি হয়েছিল উচচবর্গের টাকায় বা সাধারণের চাঁদায় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ওই আমলে এইটি ছিল ঢাকা শহরের বৈশিষ্ট্য। নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের উদ্যোগে তারাপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজেদের প্রতিষ্ঠান বা করেছিলেন পূর্তকার্য। রানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল এ - অর্থে যে সরকার কিছু অর্থ ব্যয় করতে নাগরিক সুবিধার জন্য। আর সেগুলো উচচবর্গের জন্য ভেবেই করা হতো। উদাহরণ স্বরূপবাকল্যান্ডের উদ্যোগে বাকল্যান্ড বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল এবং এ- কারণে, নদীতীরে বসবাসকারী উচচবর্গের থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়েছিল। বাকল্যান্ড কাজ পুরোপুরি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর উত্তরসূরি কাজটি শেষ করার জন্যে আবার চাঁদা চেয়েছিলেন, কিন্তু নদীতীরের অট্টালিকায় বসবাসকারীরা চাঁদা দিতে গড়িমসি করেছিলেন। লিখেছিল একটি পত্রিকা --

"...শুনিলাম, যাঁহাদিগের বড় বড় বাড়ি নদীর ধারে বিদ্যমান আছে, উপরিউক্ত - রাস্তা দ্বারা তাঁহাদিগের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগকে কিছু চাঁদা দিবার নিমিত্ত তিনি সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। ... আমরা বুঝিতে পারি না, এখানকার বড় বড় গৃহস্বামী বসাক বংশীয় বড় মানুষেরা উল্লিখিত বিষয়ে চাঁদা চাওয়া হইয়াছে, তাহাতে কেবল ঢাকাস্থ জনসাধারণের নয়, তাঁহদিকের নিজেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিকের নদীতীরস্থ প্রাসাদাবলী নির্বিঘ্ন হইয়াছে,এবং বাটীর সম্মুখবর্তী অনেকগুলো স্থানও অধিকারে আসিয়াছে।"১৭

শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম ছিল সাধারণ নাগরিকদের প্রতি তার আরেকটি উদাহরণ---

"...৪/৫ দিবস অতীত হইল তিনি (ম্যাজিস্ট্রেট) এই আদেশ করিয়াছেন বেলা ৯টার পূর্বের্ব... বালুকাময় ঘাটে কেহই স্নান করিতে পারিবে না। ৯টার পর অবধি ৩টার পূর্ব্ব পর্যন্ত যেটুকু সময় আছে, তন্মধ্যেই কাজ সারিতে হইবে। কিন্তু সদরঘাট (টে) কোনো সময়ই ভ্রমণ করা যাইবে না।... বর্ষাত্যয়ে ঢাকার নদীর তীর অতিরমণীয় হইয়া উঠে, সাহেবরা সস্ত্রীক সকালে বিকালে তথায় বায়ু সেবন করিয়া বেড়ান। তাহারা দেখিতে পান, কৃষ্ণকায় বাঙালিরা নির্ভয়ে অনাবৃত শরীরে স্নান করে। গাত্র মর্দ্দন করে। তাহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হয় না। এই ব্যাপার তাঁহাদিগের বিশেষত মেমসাহেবদিগের নিতান্ত অসহ্য ও ঘৃণাকর। অতএব ...যাহাতে ঘৃণিত বাঙালিরা এই ঘৃণিত ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার উপায় স্বরূপই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই হুকুম জারি করিয়া দিয়েছেন।..."১৮

ঢাকার সাধারণ মানুষের অবস্থাও সুখের ছিল না। সমসাময়িক কবি রাধারমণ শীল লিখেছিলেন, আগে তেল ছিল টাকায় আট সের এখন টাকায় তিন সের পাওয়াই দায়। নুনের দাম আগুন । চালও ঠিকমতো পাওয়া যায় না --

আগে টাকায় ছিল দুধ কুড়ি সের।
আটসের পাইনাকো অদৃষ্টের ফের।
ঘৃত ছাড়া মাখন কি করিব আহার।
শাক - ভাত খেয়ে কাল কাটা হল ভার।
এদিকে ওদিকে দুদিকে মারা যাই।
বাঙালীর ভাগ্যে সুখ বুঝি আর নাই।১৯
(কবিতাটির রচনাকাল ১৮৬০)

।। তিন ।।

মুঘল আমলে ঢাকার যে - নগরবিন্যাস ছিল স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিক আমলে তা ছিল না। তবে পাশ্চাত্যের অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ঔপনিবেশিক আমলেও শহরের একটি সুস্পষ্ট বিন্যাস তৈরি হয়েছিল।

অ্যান্থনি কিং দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসকরা এমনভাবে নগর পরিকল্পনা করতেন যাতে সরকারি এলিটদের সঙ্গে স্থ ানীয়দের (বা নেটিভদের) একটি পার্থক্য সূচিত হতে যাকে তিনি ‘ফিজিক্যাল সেপারেশন’ বলে উল্লেখ করেছেন।। শাসক এলিটকের পরিবেশ ছিল শৃঙ্খলাপূর্ণ, বাগানঘেরা বড় বাড়ি, প্রশস্ত সোজা সড়ক, প্রভৃতি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে স্থ ানীয়দের টাউন বা আবাসিক এলাকা ছিল ঘিঞ্জি, আঁকাবাঁকা স রাস্তা, রহস্যময়; সে - কারণে সৈনিকদের জন্যে আলাদা নির্জন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছিল সেনানিবাস।২০ আদি কলকাতাকে এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। বলহ্য াচেট অবশ্য বলেছেন, কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো উজ্জীবিত শহরগুলোতে এ - ধরনের পার্থক্য রাখা সম্ভব হতে া না। কারণ, ওইসব শহরে সিভিল স্টেশন বা সেনানিবাস গড়ার জন্যে ওইরকম আলাদা জায়গা পাওয়া যেত না। তাছ াড়া এইসব শহরে নিম্নশ্রেণির অনেক ইউরোপিয়ানও বাস করত যাদের পক্ষে এলিট এলাকায় বসবাস করা সম্ভব ছিল ন া।২১

পুনর্জ্জীবিত বড় বড় শহর যেগুলো ছিল প্রাশাসনিক এককের কেন্দ্র (যেমন কলকাতা, মাদ্রাজ বা মুম্বাই) সেগুলোতেও কিন্তু আদি অবস্থায় (ঔপনিবেশিক আমলে) কিং উল্লিখিত বিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল, যা পরে অক্ষুন্ন রাখা যায়নি। কিন্তু ,মফস্বল টাউনগুলোতে কমবেশি এ - বিন্যাস ছিল।

ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র। কিন্তু, ঢাকায় ওই ধরনের বিন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ, শহরের ইউরোপিয়ানদের বা ড়িগুলি ছিল বাগানঘেরা ও সুপরিসর, কিন্তু আলাদা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস তাদের ছিল না। নদীতীর ছিল ‘অভিজাত’ এলাকা। কিন্তু, সেখানেও ইউরোপিয়ানদের আধিপত্য ছিল না। আশির দশকে সরকারি প্রচেষ্টা ভদ্রলোকদের আবাসিক এলাকা হিসেবে উয়ারির সৃষ্টি ঔপনিবেশিক আমলে প্রথম ব্যতিত্রম। কিং - উল্লিখিত নগরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯০৫ সালে, ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং সে - ধরনটি অনেকদিন অব্যাহত ছিল। কারণ, সরকারি অর্থ তার ব্যবহার করতে পেরেছিল নতুন রাজধানীগড়ে তোলার সুবাদে। আগে, ঢাকা শহরের অবয়বগত যে - অবস্থা ছিল সে - অবস্থায় খাঁটি ঔপনিবেশিক বিন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। অর্থের জোগানদারও ছিল না।

এ - আলোচনায় আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। মুঘল আমলে যে - শহরে গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দেখিসে - শহরের জৌলুস আর নেই। ঢাকা পরিণত হয়েছিল দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত একটি শহরে। সে - পরিপ্রেক্ষিতে প্রা জাগতে পারে, ঢাকার পুনর্জ্জীবন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এসময় টেইলরের বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, “moreover certain development at above that date put the city on the road to renewed activity : a new era was beginning with 1840 as watershed.”22

একটি শহরের পুনর্জ্জীবন ঘটেছে কিনা তা বিচারের বেশকটি মাপকাঠি আছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো তারিখও নির্ণয় সম্ভব নয়। শরিফ উদ্দিন বলতে চেয়েছেন, ঢাকা কলেজে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর স্থাপিত হয়েছিল পৌরসভা, গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন স্কুল, দোকানপাট ইত্যাদি।

এটি একটি মাপকাঠি, কিন্তু, যদি আক্ষরিক অর্থেও পুনর্জ্জীবন শব্দটি ব্যবহার করি তাহলে ঢাকার ক্ষেত্রে সময়টি আরো তিন দশক পিছিয়ে দিতে হবে। সময়টা হবে উনিশ শতকের ষাট থেকে সত্তরের দশক বা এর মাঝামাঝি সময়। এসময়ের

উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৌরসভা স্থাপন। শরিফ উদ্দিনও তাই উল্লেখ করেছেন। তবে, পৌরসভা শুধু নয়, মুদ্রণশিল্পের বিকাশ ঘটে এসময়ে। ব্রাহ্ম - আন্দোলন বিকশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংবাদপত্রের প্রকাশও। ফলে, মনোজগতের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাটচাষেরসম্প্রসারণ মধ্যবিত্তের বিকাশে সাহায্য করে। শহরে, সেসব কারণে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি আবার এসময়েই শু হয়, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত। সে - সময় থেকে ঢাকার জনসংখ্যা কখনো হ্রাস পায়নি। ব্যবহার পুনর্জ্জীবনও এসময় লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্তের জীবনযাপন পদ্ধতির রূপ বদলে যেতে থাকে। ১৮০০ শতক থেকে বনজঙ্গল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে ঢাকাকে রক্ষার যে - প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল এসময়ে তা জোরদার হয়। লক্ষণীয় যে, তা নতুন নগরবিন্যাস সৃষ্টি করেনি। পেশাজীবী এলাকাগুলির মৌলিকত্বও তখন ছিল না। ইউরোপীয়দের বাসস্থান, আগেই উল্লেখ করেছি সুপরিসর ছিল, কিন্তু মিশ্র পাড়াতেই তাদের বসবাস করতে হতো। এদিক থেকে বিচার করলে উনিশ শতকে ঢাকার নগরবিন্যাস, উল্লিখিত ঔপনিবেশিক নগরবিন্যাসের সঙ্গে খাপ খাবে না।

।। চার ।।

ঢাকা পৌরকমিটি বা সভা গঠিত হওয়ার পর পৌরপিতারা যে - সমস্যার সম্মুখীন হলেন, তা হলো শহরকে বনজঙ্গল ও শহরবাসীকে মহামারি থেকে রক্ষা করা। আগেও কোম্পানির প্রশাসকরা এই সমস্যা মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। আমরা দেখব, পৌরপিতারা শত সমালোচনা সত্ত্বেও এসব কাজ সফল করতে সমর্থ হয়েছিলেন অনেকটা। তবে, এ - সাফল্যের পেছনে ত্রমাগত লোকসংখ্যাবৃদ্ধিও একটি কারণ। আগেও উল্লেখ করেছি, মানুষের মনোজগতেও একটি পরিবর্তন আসছিল, পরিবর্তন ঘটছিল এক ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে হলেও জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে।২৩ এ - প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, এ - দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে উয়ারী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, বা দীননাথ সেন গেন্ডারিয়া পত্তন করতে পারতেন না।
আগে উল্লেখ করেছি, মুঘল আমলে সারা শহরব্যাপী ছিল ক্যানাল, যা একদিকে যাতায়াত ও অন্যদিকে ময়লা নিষ্কাশনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। এই ক্যানাল শহরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেছিল। তাই অনেকে ঢাকাকে ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তুপরবর্তীকালে এইসব ক্যানাল ভরাট করে ফেলা হয় বা ভরাট হয়ে যায়, ফলে ময়লা নিষ্কাশন এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
১৮৩৬ সালে ঢাকা প্রকাশে ঢাকা শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে চারটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।২৪ কারণগুলি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কসাইদের আস্তানা, বনজঙ্গল বৃদ্ধি এবং আবর্জনা। ২৫ কিন্তু ব্রিটিশ আমলের ঢাকার ভয়াবহ অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় তৎকালীন ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফ ও কমিশনার সিম্পসনের দুটি রিপোর্টে। কোম্পানি আমল থেকেই ঢাকা খ্যাত ছিল তার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে। জনৈক পর্যটকের ভাষায়, ঢাকা শহরের পূতিগন্ধ বুড়িগঙ্গায় দুমাইল ভাটি থেকেই নাকে লাগত। কাটক্লিফ ১৮৬৯২৬ সালে ঢাকা শহর সম্পর্কে পৌরসভার চেয়ারম্যান গ্রাহামের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।২৭ তিনি রিপোর্টে লেখেন যে, ঢাকা শহরে ময়লা নিষ্কাশনের কোনো বন্দোবস্ত নেই এবং যুগ যুগ ধরে এই আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছে শহরের লোকদের বাড়ির আঙিনায়, রাস্তায়। শহরের কুয়োর পানি ভয়ানকভাবে দুষিত, এর মধ্যে যতসব ময়লা আবর্জনা; কালের ও নদীর পানি দূষিত , শহর বিভক্ত অসংখ্য সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি দ্বারা এবং সেখানেও ময়লা উপচে পড়েছে, ফলে বাতাস দূষিত। আর এছাড়া আছে একটিনোংরা খাল, দুর্গন্ধময় ড্রেন এবং জঙ্গল।
এককথায় বলা যেতে পারে, শহরের আদিবাসীরা যে - জমিতে বাস করে তা নোংরা, স্যাঁতস্যাঁতে, যে - বাতাস তারা অহরহ গ্রহণ করে তা দূষিত এবং যে - পানি তারা পান করে তাও বিষের মতো।
এছাড়া, শবদাহ ও কবর দেওয়াও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে শেষোক্তটি। ১৮৬৪ সালের ঢাকা প্রকাশে লেখা হয়েছে ---“...ঢাকায় যে সকল ইতর মুসলমান বাস করে, তাহাদিকের শব সমাহিত করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। লোকগমনাগমনের পথের পার্শ্বে যে সকল স্থান ছাড়া পড়িয়া থাকে, অনেকে সেই সকল স্থানে, অনেকে নিজ নিজ বাটিতে মৃত শরীর নিখাত করিয়া রাখে। জনাকীর্ণ তাঁতিবাজার ও বংশালের সন্নিহিত নতুন সড়কে পূবর্ব পার্শ্বে এত শব নিধান হইয়াছে যে ঢাকায় তিলার্ধ শূন্য রয়নাই।” পত্রিকায় এ - রিপোর্ট হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত কিন্তু একথা সত্যি যে, ওই সময়ে কবর ঢাকা শহরের স্বাস্থ্যের পক্ষে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

না, এখানেই শেষ নয়, এ-পরিবেশে ঘুরে বেড়াত প্রায় দশ হাজার ক্ষুধার্ত কুকুর। আর ছিল মহামারি। ঢাকায় প্রতিবছর দুবার ফাল্গুন - চৈত্রে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের পর এবং বর্ষাকালে কলেরা দেখা দিত। তখন মনে হতো ঢাকা যেন জনশূন্য হয়ে যাবে। পথে পথে তখন কেবল 'হরিবোল', কান্নার রোল, অনাথ ছেলে মেয়েদের চিৎকার, দোকানপাট বন্ধ। সুসাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় -- "কলেরা তাঁতিবাজার হইতে শু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুবাজার অভিমুখে রওয়ানা হইল।। স্কুলে যাইয়া দেখিলাম ত্রমশ ছেলে কমিয়া যাইতেছে। তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়ে যাইতেছে। পথে দোকানপাটে শুষ্ক ভীতনেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে -- সেরূপ ভয় কলিকাতার মত স্থানে দাঁড়াইতে পারে না।"২৮ ঢাকা প্রকাশ লিখেছিল -- "মাসাধিককাল হত হইতে চলিল, এখনো ঢাকা হইতে ওলাউঠার তিরোধান হইল না। প্রত্যুত আজিকালি উত্তরদিগ্বর্ত্তী নবাবপুর প্রভৃতি স্থানে উহার প্রকোপ সমধিক পরিমাণেই লক্ষিত হইতেছে; কিছুতেই শান্তি হইতেছে না। স্থানীয় লোকেরা এই ভয়ে নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে।"২৯ আর পথকবি কুশাই সরকার লিখেছিলেন---

"ঢাকাতে মা তব ভয়ে, বাসা ছেড়ে সব পলাইলে, মাগো
বসন্ত রোগ উদয় হইয়ে, হাজার নয়শত লোক মরিলে।"৩০

মহামারির সময় অবস্থাপন্ন মানুষজন মেঘনা থেকে খাবার পানি আনতেন। সাধারণের পানির উৎস ছিল বিষাক্ত পাতকুয়ো।এই পানি মহামারি আরো বৃদ্ধি করত। অর্থাৎ , সমস্ত যাতনা পোহাতে হতো নিম্নবর্গের। উচ্চবর্গ -- সংখ্যা অবশ্য ছিল তাদের কম -- এ - যাতনা থেকে ছিল অনেকাংশে মুক্ত, যদিও ঢাকা শহর চালু রাখছিল নিম্নবর্গের মানুষেরাই।

কাটক্লিফ সত্তরের দশকের দিকে শহরের উন্নয়নকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন।৩১ প্রস্তাবগুলি হলো, ময়লা ফেলার জন্যে ঢাকার উত্তরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা, শহরের মাঝে 'গ্রিন বেল্ট' সৃষ্টি করা, শহরের মধ্যে কবরস্থানগুলি বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু ঢাকা প্রকাশের বিভিন্ন সংবাদ পাঠক করে জানা যায়, এসব সমস্যা কখনো দূর হয়নি।

এমনকী নবীনচন্দ্র সেন (নির্দিষ্ট তারিখ তিনি উল্লেখ করেননি) ১৮৮০ সালে ঢাকা সম্পর্কে লিখেছিলেন ---"ঢাকায় দুইদিন ছিলাম, ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই। দেখিবার বড় কিছুই ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সংকীর্ণ এবং এমন স্যাঁতস্যাঁতেও দুর্গন্ধময় যে দু'টি দিন মাত্র থাকিতে আমার কষ্টবোধ হইয়াছিল।"৩২

অথচ ১৮৬৯ সালে গ্রাহাম লিখেছিলেন, শহরের অবস্থার উন্নতি হলে অথাৎ শহর পরিষ্কার রাখতে পারলে মফস্বলের জমিদাররা ঢাকায় এসে বসবাস করবে, জমির দাম বাড়বে। ঢাকা সম্ভ্রান্ত শহরে পরিণত হবে।৩৩ কিন্তু কখনো শহর পরিচ্ছন্ন হয়নি। তবুও ঢাকার প্রতি সবাই আকর্ষণ বোধ করতো কারণ "ঢাকা পূর্বরাজধানীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোনো নগরে নাই।"৩৪ বিংশ শতকের গোড়ায় এসেও শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নতি হয়নি। ১৮৯৯ সালে বাংলার স্যানিটারি - ইঞ্জিনিয়ার এ. ই. সিল্ক লিখেছিলেন, "...Since I have been sanitary Engineer I have Seen a Good Deal never has it been my lot to have to inspect anything so revolting as I have seen in Dacca."৩৫ পৌরসভা স্থাপনের আগে রাস্তা বলতে যা বোঝায়, ঢাকায় তা ছিল না। মুঘল আমলে চলাচলের জন্যে ব্যবহৃত হতো জলপথ। মহল্লাগুলি যুক্ত ছিল গলি দ্বারা। সুবাদার মোহাম্মদ আজম প্রথম হাতি, ঘোড়া এবং মানুষ চলাচলের জন্যে ইট বিছানো রাস্তা তৈরি করেছিলেন।৩৬ ফলে যানবাহনের কথা সহজেই অনুমেয়। টেইলর ১৮৪০ সালে লিখেছিলেন। - "Wheel conveyances are unknown in the city"... এবং শহরে ঠেলার সংখ্যা বারোর বেশি হবে না।৩৭ ঘোড়া বা হাতিই ছিল প্রধান বাহন। ১৮৭১ সালেও দেখা যায় হাতি বাহন হিসেবে প্রচলিত। সরকারি হাতি ওই সময়ে শহরসংলগ্ন কাঁচা রাস্তা ক্ষতি করলে সরকার পৌরসভাকে পাঁচশো টাকা দান করে।৩৮ বাকল্যান্ডের সময়ে ঢাকার রাস্তাঘাট তৈরির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। ঢাকাবাসী ধন্যবাদ জানানো হয় নদীর বরাবর 'মেটালড' রাস্তা তৈরির জন্যে। ওই সময়ে পৌরসভা রিপোর্ট ৪০ দেখে মনে হয় রাস্তার ব্যাপারে তারা খুব চিন্তিত ছিল। পুরনো অট্টালিকার রাবিশ দিয়ে শহরের কয়েকটি গুত্বপূর্ণ অঞ্চল যুক্ত করার জন্যে' মেটালড' রাস্তা তৈরি করা হয়। সে রাস্তা কাটা হলো (১) উর্দু রোড হয়ে চক থেকে লালবাগ, (২) নারিন্দা খাল থেকে গোরস্থান (?), (৩) আগাসাদেক রোড হয়ে নবাবপুর থেকে পূর্বে দয়াগঞ্জ এবং (৪) মালিটোলা হয়ে ব্যাংকশাল (বংশাল) থেকে তাঁতিবাজার। কিন্তু মূল রাস্তা (রিপোর্টে উল্লিখিত মেইন রোড) ছিল রায়স

াহেব বাজার থেকে নবাবপুর যাতে এইসময় ঝামা বিছানো হয়। এরপর অবশ্য আস্তে আস্তে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রধ ান যানবাহন হয়ে ওঠে ঘোড়ার গাড়ি।৪১ ওই সময়ে (১৮৭১ -এর দিকে) ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ। ১৮৮০ সালে ঢাকা প্রকাশের একটি সংবাদে এ - সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে -- "ঢাকার গাড়ির অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না। দিন দিনই ঐ অত্যাচার বাড়িয়া উঠিতেছে। একেত ঢাকার রাজপথগুলি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ তাহাতে গাড়ির সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে..." এবং তখন গাড়ির রেজিস্ট্রিকরণের আবেদন জানানো হয়েছে,৪২ সংকীর্ন রাস্তা প্রশস্ত করার ধুম পড়েছে, গাড়ির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে -- এ - সবই দ্রুত নগরায়ণের কথা প্রমাণ করে।

তবে, মূল কথা তা নয়। পৌরসভা হয়েছিল শহরের সব মানুষের জন্য। সীমিত অবস্থায় শহরের পরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে ত াদের ভাবতে হয়েছে, অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তারা পায়নি। কিন্তু, উনিশ শতকের শেষার্ধে যখন পরিশ্রুত পা নি বা বিশ শতকের শুতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন সেই পরিশ্রুত পানি বা বিদ্যুৎ কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হয়েছিল সেটি বিচার করলেই বোঝা যাবে তারতম্য কেমন ছিল। পৌরপিতারা প্রভাবশালী শ্রেণিৰ কথাই ভেবেছে। অধস্তন শ্রেণির কথা নয়। কারণ, পৌর কমিশনারদের শ্রেণিবিন্যাস।

একটি উদাহরণ দিই, ধরা যাক বিদ্যুতের কথা। যে - অঞ্চলে বৈদ্যুতিক বাতির প্রয়োজন ছিল বেশি (বিশ শতকের গোড়ার দিকে) সেসব অঞ্চলে তা না বসিয়ে বসানো হয়েছিল প্রধানত ইংরেজ ভদ্রলোক - অধ্যুষিত অঞ্চলে বা রেসকোর্সের রাস্ত ায়। পানি সরবরাহের বা হাইড্রেন্ট বসানোর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই।৪৩ যেখানে বসবাস করতেন সরকারি কর্মচারী বা ভদ্রলোকেরা, যেখানে স্থাপিত হাইড্রেন্টের সংখ্যা এবং ঘিঞ্জি এলাকায় স্থাপিত হাইড্রেন্টের সংখ্যা বিচার করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই সময়ে সরকারি রিপোর্টও তা স্বীকার কার হয়েছিল।

সে থেকে এ পর্যন্ত কী সে - অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? গুলশান, বারিধারা, বনানী বা ধানমন্ডিতে যে - পৌরসুবিধা তা কি ইসলামপুর, খিলগাঁও বা মিরপুরে আছে? নেই। এমনকী সেসব স্থানে উচচবর্গ বা নিম্নশ্রেণির মানুষ বসবাস করলেও। এমনকী বর্তমানেবিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কথা ধরা যাক। মিন্টুরোড বা পার্শ্ববর্তী এলাকা বা গুলশান - বনানীতে দিনে কয়েকঘন্টা লোডশেডিং হয় আর অন্যান্য অঞ্চলে?

।। পাঁচ ।।

ঢাকার ঘরবাড়ি, আবাসিক এলাকা, এর বিন্যাস তুলে ধরে ঢাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ১৮৯০ -এর আগে আবাসিক এল াকাগুলি গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে, নাগরিকদের সামর্থ্য - অনুযায়ী। এসব বাড়িঘরের হিসাব থেকে নাগরিকদের স াফল্যের হিসাবটিপাওয়া যায়। ১৯৪৭ -এর পর সরকারি (বিশেষ করে আমলাদের) উদ্যোগে গ্রামকে গ্রাম ধবংস করে গড়ে ওঠে উচচবর্গের জন্য আবাসিক এলাকা, যা ছিল উচচবর্গের ভবিষ্যতের জন্য এক ধরনের বিনিয়োগ।

১৮৩২ সালের এক হিসাবে জানা যায়, ঢাকা শহরে ওই সময় জনসংখ্যা ছিল ৬৬৬৬৭ জন। ১৭৮ টি বসতবাড়ির মধ্যে মুসলমানদের ছিল ৮৮২৫ ও হিন্দুদের ৭৩২৭ টি। ওই সময় ইটের তৈরি বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩১৬৪ টি। আর খড়ে াকুটির ১৭৯৬৩টি।

একতলা, দোতলা ও তিনতলা -- এই তিনরকমের ইটের তৈরি বাড়ি ছিল ঢাকা শহরে। এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৫৩, ১৯১০ ও ১০৪ টি। প্রাচীরঘেরা বাগানসুদ্ধ বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৫৩টি। এই তিনরকমের বাড়ি ইসলামপুরে ছিল বেশি। অর্থাৎ ওই আমলে ইসলামপুর ছিল বর্ধিষ্ণু ও অভিজাত এলাকা। তবে, আমরা ধরে নিতে পারি, বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত এই বাড়িগুলি ছিল সাদামাটা। এগুলোর অধিকাংশের স্থাপত্যিক কোনো সৌন্দর্য বা গুত্ব ছিল না।

ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ বুড়িগঙ্গার তীর দখল করেছিলেন শহরের অভিজাতরা। ৪৪ অর্থাৎ নদীর ধার ঘেঁষে ছিল জমিদার প্ল্যান্টার ও অভিজাতদের বাড়ি। এবং এগুলির এক ধরনের স্থাপত্যিক ঐক্য ছিল। ঢাকা শহরে সুদৃশ্য বাড়ি বলতে এগুলিকেইবোঝাত। জেমস টেইলর লিখেছেন, ১৮৪০ সালে সালে নদীতীরের অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে তখন 'ভেনিসের ন্যায় জলোত্থিত নগরী বলে প্রতীয়মান হতো'।

তবে, চল্লিশের দশকেই এগুলিতেই ভাঙন ধরেছিল। যখন দর্শক ওই মনোহর দৃশ্য দেখতে আসতেন তখন দেখতেন নদীর ধ

ার ঘেঁষে ধবংসোন্মুখ অনেক অট্টালিকা। অনেকগুলির ভিত গেছে ধসে, অনেকগুলি নদীতে পড়ো পড়ো।

টেইলর আরো লিখেছেন, বাংলার অন্যান্য শহরের দালানকোঠার ন্যায় এগুলোর স্থাপত্যরীতি অনেকটা একই রকম। সড়কমুখো বাড়িগুলি সাধারণত খুব প্রশস্ত এবং এক থেকে চারতলা পর্যন্ত উঁচু। ওয়ালটারের উপাত্তে চারতলা বাড়ির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৮৪০ সালের দিকে শহরের কিছু বাড়িঘর উঠেছিল চারতলা পর্যন্ত।

ইউরোপীয়দের (এবং অবাঙালি জমিদারদের) বাড়িগুলি আগেই বলেছি, ছিল নদীর ধার ঘেঁষে বড়সড় এবং সুন্দরভাবে তৈরি। এসব বাড়ির ছাদে আবার বাগান ছিল। তবে, টেউলর লিখেছেন, "শহরের আর্মেনীয় ও গ্রিক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় ইটের তৈরি ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু সেসবের অধিকাংশ যাচ্ছে ধবংস হয়ে।" জমির দাম সবচেয়ে বেশি ছিল শাঁখারীবাজার ও তাঁতিবাজারে।৪৫

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। শহরের বিভিন্ন বাড়ি পুরনো মা লিকদের হাত থেকে বদল হয়ে যায় বা নতুন পেশাজীবীরা নিজেরাই দালান তুলতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৮৮ স ালের সংবাদপত্রের এক খবরে জনা যায়, নবাবগঞ্জ, চাঁদনিঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে তো বটেই, শহরের মধ্যভাগেই অধিকাংশ ছিল খড়ের ঘর। দৃশ্যটি নিশ্চয় খুব মনোহর ছিল না, কিন্তু এই দৃশ্য আবার প্রমাণ করে শহরে মধ্যশ্রেণির প্রসার এবং দরিদ্রের ত্রমবর্ধমান দারিদ্র্য।

অবশ্য মধ্যশ্রেণির চাকরিজীবীরাও যে খুব অনায়াসে বাড়ি তুলতে পারতেন, তা নয়। বর্তমানে সৎ চাকরিজীবীর মতো ত াকেও নির্ভর করতে হতো ঋণের ওপর। এ - পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯০ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট --

উয়ারী নামে কতকটা ভূমির উপরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়াতে তাহাতে লোক বসাইবার জন্য প্রচুর যত্ন ও অর্থব্যয় হইয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় অনেকগুলি সড়ক গবর্নমেন্টের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। ঢাকায় যাহাদের বসতবাড়ি নাই সেইসব ভদ্রলোকদিগের প্রার্থনা অগ্রগণ্য করিয়া বিঘাপ্রতি বার্ষিক আধ বিঘা করিয়া পত্তন করা হইয়াছে। ইতোমধ্যে তথায় কেহ কেহ বাড়ি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেও অর্থাভাবে অনেকেই কিছু করিতে পারে নাই। ইহা জানিতে পারিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে সকল রাজকর্মচারীকে ঐরূপ অসমর্থ দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া তাহা হারহারিতে দেড় বৎসর কাটিয়া লওয়া সুস্থিরকরতঃ উপারিতন গবর্নমেন্টের অনুমোদনের জন্যে পাঠাইয়াছেন।৪৬

আশি থেকে নববই দশকের মধ্যে, বর্তমান ধানমন্ডি গুলশানের মতো ভদ্রলোক অর্থাৎ মধ্যশ্রেণির জন্যে কিছু আবাসিক এলাকা যেমন, উয়ারি, গেন্ডারিয়া, টিকাটুলি, স্বামীবাগ প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। ওই সময়ে এ - এলাকাগুলো ছিল মূল শহরের অন্তর্গত, আরো পরে, এ শতকের তৃতীয় - চতুর্থ দশকে একইভাবে গড়ে উঠেছিল পুরানা পল্টন।

নতুন গড়ে - ওঠা এসব আবাসিক এলাকার ঘরবাড়ি ছিল পুরানো এলাকার ঘরবাড়ি থেকে ভিন্ন। এসব এলাকায় বা ড়িগুলি দেখলে বোঝা যায়, পরিবর্তন হয়েছে মধ্যশ্রেণির চির। গ্রামের সঙ্গে তার বন্ধন হয়েছে খানিকটা শিথিল। কিন্তু গ্র ামের স্মৃতি বা নস্টালজিয়ার রেখা মিলিয়ে যায়নি তখনো। স্থপতি রবিউল হুসাইন এ - প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমাকে য া বলেছিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, গ্রামে যেমন দখিন দুয়ারী ঘর, উঠোন, রান্নাঘর সব আলাদ আলাদা হয়েও একটি ইউনিটের মতো, এসব এলাকার বাড়িগুলিও এমনি।

উয়ারি, টিকাটুলি া পরবর্তীকালের পুরানা পল্টানের বাড়িগুলো জাঁকালো নয়, কিন্তু ঘরোয়া, পরিচ্ছন্ন, প্রাচীরঘেরা, ফুল ও ফলের বাগানে পূর্ণ, ঘরগুলো বড়সড় এবং তেমন অন্ধকারাচছন্ন নয়। এসব তৎকালীন পেশাজীবী / মধ্যবিত্ত চির পরিবর্তনেরই লক্ষণ। বিখ্যাত অথানীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ১৯২২ সালের এসব এলাকা সম্পর্কে যে - বিবরণ দিয়েছেন, ত াতে চিত্রটি আরো স্পষ্ট হবে।লিখেছেন তিনি --

ওয়ারি ঠিক শহরতলি নয়, কিন্তু শহরের মধ্যে হয়েও একটি ভিন্ন রকমের উপাস্তিকা না হলেও প্রান্তিক। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, রাস্তায় লোক বেশি নেই, যারা আছে তারও পোশাকে পরিচ্ছদে মার্জিত। বাড়িগুলো সুন্দর-- একতলাই বেশি, কযেকটিমাত্র দোতলা আর প্রত্যেক বাড়িতে অনেকটা খোলা জমি।...এখানে রমনার অভারতীয় উদ্যান নগরীর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, পুরানো পল্টনের নবীনতা নেই, টিকাটুলির গ্রাম ছোঁওয়া ভাব নেই, নবাবপুরের ঘিঞ্জি বসতিও নেই। সবই একটু সংযত সবই বাহুল্য বিহীন। এখানে যাঁরা থাকতেন তারা মধ্যবিত্ত। দু'একজন জমিদার ছাড়া খুব বড়লোক প্রায় কেহই নন। চরম দাবিদ্র্যও এখানে দেখা যেত না। প্রধানত থাকতেন কয়েকজন আদি বাসিন্দা, যারা পনের কুড়ি বছর আগে প্রায় বিন

ামূল্যে এখানে জমি নিয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী-- ডেপুটি, মুন্সেফ, জেলা জজ। এঁরা সকালে বাজারে যেতেন এবং গৃহভৃত্যের হাতের থলে, ঝুড়ি ভরতি বাজার করে আসতেন, আর বিকেলে পল্টনের মাঠে বেড়াতে যেতেন।”৪৭

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানী হলে নজর দেওয়া হয়েছিল ক্রমোন্নয়নের দিকে। ১৯০৬ সালের ঢাকা সম্পর্কে লিখেছিলেন হৃদয়নাথ মজুমদার ---

বন্যজন্তুর আবাসস্থল ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশেপাশে জলা জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে অট্টালিকা। শহর বাড়ছে উত্তরে, তৈরি হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট আর ইউনিভার্সিটি, রমনার বনভূমিতে বড়লোকেরা যত পারছে জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ওই ঝোঁক কমে গিয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছিলেন হৃদয়নাথ মজুমদার --

কিন্তু এক সময় আসবে যখন রমনাই হয়ে উঠবে ঢাকা শহরের সমস্ত অফিস আদালতের কেন্দ্র। তখন চক, নলগোলা, বাবুবাজার, ইসলামপুর এবং বাংলাবাজারের মতো, পুরোনো অঞ্চলগুলি হারিয়ে ফেলবে জৌলুস। আর উত্তরে গড়ে উঠবে ক্যান্টনমেন্ট।৪৮

এ - ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হবে, হৃদয়নাথ তা নিজেও ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ।

।। ছয় ।।

বঙ্গভঙ্গের পর যে নতুন ঢাকার পরিকল্পনা করা হয় তাও ছিল উচ্চবর্গের আশা ইচ্ছার চির প্রতিফলন। এ ঢাকা গড়ার পেছনে ছিল পুরনো ইংরেজ সিভিল স্টেশন গড়ে তোলা। এ- স্টেশন হবে পরিচ্ছন্ন, বৃক্ষশোভিত, দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকার সমাহার, যেখানে বসবাস করবে উচ্চবর্গের আমলারা।

আই সি এস আর্থার ড্যাশ তখন এসডিও। ঢাকায় সে - সময়ে কার্যোপলক্ষে কয়েকবার এসেছিলেন। সে - সময়ের ঢাকার কিছু বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে। লিখেছেন তিনি, বঙ্গভঙ্গ হওয়ার আগে পর্যন্তও ঢাকা ছিল ‘ডার্লিং চাইল্ড অব টপ পলিটিক্যাল প্ল্যানার্স’। এরা লাল ইটে গাঁথা একটি রাজধানীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর নিসর্গ - পরিকল্পনাবিদরা ভাবছিলেন, কীভাবে তারা এই প্রাদেশিক রাজধানীটিকে ভরিয়ে তুলবেন বৃক্ষে ও বাগানে।

রমনা ছিল পরিকল্পনাবিদদের ইচ্ছাপূরণের জায়গা। এক হাজার একরের এই মাঠটিকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যার মধ্যেছিল একটি রেসকোর্স, একটি ক্লাব, একটি পোলো গ্রাউন্ড, ক্রিকেট মাঠ, বারো হলের একটি গলফ কোর্স আর দুটি হিন্দু মন্দির। রেসকোর্সটি ঘিরে একটি রাস্তা। রাস্তাটি ঘিরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজর্কচারীদের জন্যে বাসস্থান। যার পদ যত উঁচু, তাঁকে ততো ভালো জায়গায় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। যেমন, লে. গভর্নর, হাইকোর্টের বিচারক, কাউন্সিল সদস্যদের বাড়ি এমন জায়গায় যেখান থেকে অবশ্যই রেসকোর্সের উইনিং পোস্ট দেখা যাবে এবং বিনা আয়াসে পৌঁছা যাবে গলফ কোর্সে। সরকারের সচিব ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাড়ি একটু দূরে। ক্লাবে বা গ্রান্ডস্ট্যান্ডে যেতে হলে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক প্রান্তে স্থানীয় কর্মকর্তা, কমিশনার, কালেক্টর, সেশন জজ, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের বাসা। নওয়াবপুরে অফিসে যাওয়াটা যেমন তাদের জন্য ঝামেলার ও দূরের, ক্লাবে বা গ্রান্ডস্ট্যান্ডেযাওয়ার ব্যাপারটাও তাই।৪৯

প্যাট্রিক গেড্ডেস ছিলেন বিখ্যাত এক পরিকল্পনাবিদ। ১৯১৫ সালে মাদ্রাজ সরকার তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ জানায়, মাদ্রাজের কয়েকটি শহর পুনর্নির্মাণের। সেই সময়ে গেড্ডেসকে ঢাকায় একটি নগর উন্নয়ন - পরিকল্পনা তৈরির অনুরোধ জানানো হয়। কে, কেন এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন জানি না। তাঁর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। রমনায় তখন ব্বিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চলছে। এ - প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন -- “আমি আবারো কেবল বিস্মিতই হতে পারি এই ভেবে যে, সরকারি দপ্তর ঢাকা থেকে সরাবার পর কেন পৌরসভা এই শহরতলিটি অধিগ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেনি, বা অন্তত তা বেছে নেবার ক্ষমতালাভের চেষ্টা করেনি;অথবা তার অপরাগতায় কেন নাগরিকদের কোনো দায়িত্বশীল সংস্থা সাধারণ স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসেনি। এখন সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক উদ্যমহীনতা, তার আর কোনো বিষাদময় পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়।

যাই হোক, একটা পরিষ্কার যে, কোনো অবস্থাতেই পৌরসভার এ - ধরনের নিৎসাহ বা অবহেলার সুযোগ নিয়ে কোনো নতুন ঋিবিদ্যালয়ের যাত্রা শু হওয়া উচিত নয়। 'মহল্লা ও আলখেল্লা' -- এ দুয়ের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার যেসব কারণ ঋিবিদ্যালয়সমূহ ও তাদের নগরীকে অতি সচরাচর ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে এত গুতর বা উভয়ের জন্য এত অশুভ সম্ভাবনাপূর্ণ কোনো কারণ কখনো দেখিনি, এ - বিষয়টি যেমন হতে পারে।"৫০

গেড্ডেসের পরিকল্পনার মূল ফোকাস ছিল বিদ্যমান পুরনো শহরের মান উন্নয়ন, যা সাধারণের অনুকূলে যাবে। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়নি। অথচ তিনি, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা নগর - পরিকল্পনার প্রারম্ভিক পর্যায়েও ঢাকা নগরীর জনগোষ্ঠী, তাদের আবাসন, কর্মস্থান ও বিনোদনস্থলের সুষম বিন্যাস, আর আনুষঙ্গিক নাগরিক মনোরমতা ও বিরাজমান জল, স্থল, সড়ক, উদ্যান ইত্যাদির সুচিন্তিত ব্যবহার সম্পর্কে যে সচেতন মনোভাব দেখিয়েছেন"৫১ আজো সেই উপলব্ধির অভাব বিদ্যমান।

শুধু গেড্ডেস কেন, এর পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে ঢাকা নগরীর অনেক উন্নয়ন - পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনোটিকেই কার্যকর হতে দেওয়া হয়নি। সেগুলোকে কখনো কখনো আংশিক কার্যকর করা হয়েছে, যা উচচবর্গের স্বার্থের অনুকূল। সে - আলোচনায় পরে আসব। ১৯৪৭ -এর আগে দেখি, যে নতুন ঢাকা গড়ে উঠেছিল তাতেও নি ম্নবর্গের কোনো স্থান ছিল না। অন্যদিকে, পুরনো ঢাকা পরিণত ত্রমেই এক অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি জায়গায়। এক ইংরেজ য াজকের কবিতায় সে - চিত্র পাওয়া যাবে, যদিও তালেখা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে --

এই মহতী শহরের নোংরা গলির বাহিরে
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ কেশের অগণিত মানুষজন,
জোড়া হাতে তারা প্রার্থনা মাগে ঈশ্বরে,
কিংবা রোগী দেখতে ধীরে অতিত্রমী জীবন।
সেখানে তারা এক পয়সার মাটির থালা ধরে,
নোংরা ফোঁকরে খাচ্ছে খাদ্য - খাবার
ন্যাংটো শিশু জীর্ণ কাটের পরে
খেলছে, আর একটি নারী বাড়ির প্রতি বিকার।৫২

।। সাত ।।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে সরকারি উদ্যোগে উচচবর্গের জন্য তৈরি হলো বিস্তৃত কিছু আবাসিক এলাকা - ধানমন্ডি গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তর। ব্যত্তিগত বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছিল পল্লবী, এখন, যেমন বসুন্ধরা, আফত াবনগর, বনশ্রী ইত্যাদি। সামরিক আমলাদের জন্য ডিওএইচএস, নিউ ডিওএইচএস এভাবে গড়ে উঠেছে। এখন সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে সবচেয়ে বৃহত্তম আবাসিক এলাকা - পূর্বাচল ও ঝিলমিলি।

উয়ারি, গেন্ডারিয়া, টিকাটুলি, গোপীবাগ বা পল্টনের গড়ে - ওঠার সঙ্গে এদের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। উয়ারির কথা আগেই বলেছি, তা ছিল খাসজমি, কাউকে উচ্ছেদ করা হয়নি সেখানে। অন্যান্য জায়গায়ও জমি কিনে বসতবাড়ি ব া আসাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে, জোরজবরদস্তি করে নয়। ওইসব দরিদ্ররা জীর্ণ কুটিরে বসবাস করেছে, তবে, বস্তি গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আমলে গড়ে - ওঠা আবাসিক এলাকাগুলির পেছনের কাহিনী কশ। প্রধ ানত সরকারি আমলাদের উদ্যোগে এগুলি গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক ছিল এরা। আমি একসময় ঢাকার এক পুরনো বাসিন্দা জনাব নাছির আহমদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তিনি এর পটভূমিকা ব্যখ্যা করেছিলেন। শহরে মধ্যবিত্তের কীভ াবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এটি সে- ইতিহাসের নির্যাস। তবে, এর পুরোটাই প্রধান কারণ তা নয়।

জায়গির প্রথার চল উনিশ শতক থেকেই ছিল। ঢাকায় যিনি চাকরি বা ব্যবসা - বাণিজ্য করতেন তার বাসায় এসে আশ্রয় নিতেন গ্রামের প্রতিবেশী থেকে আত্মীয় - স্বজন সবাই। এদের অনেকে ঢাকার স্কুল - কলেজে পড়াশোনা করতেন। কারণ বিত্ত অর্জনের জন্য বিদ্যাও তখন ছিল প্রয়োজনীয়। অনেকে আবার আসতেন স্রেফ চাকরি - বাকরির খোঁজে। তবে এটি

প্রচলিত ছিল হিন্দুসমাজেই বেশি।
বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে, গ্রাম থেকে মুসলমান যুবকরা আসতে লাগলেন ঢাকায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্যে। এদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। ঢাকায় থেকে লেখাপড়ার খরচ চালানোর মতো সামর্থ্য তাদের ছিল ন া। তখন ঢাকার এইসব মহল্লার দরিদ্র অধিবাসীরাই এদের হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলেন।
প্রায় প্রতিটি মহল্লার এ - ধরনের যুবকদের আশ্রয় দেওয়া হতো। তারা পড়াশোনা করতেন আর থাকতেন মহল্লায় কারো বাড়িতে। খাওয়া - দাওয়ার ভারও ছিল গৃহকর্তার। এ বিনিময়ে গৃহকর্তার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে হতো। শুধু যারা জায়গির থাকতেন তাদের বলা হতো মাস্টার সাহেব। এই মাস্টার সাহেবদের মহল্লার সবাই দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে; কারণ তারা পড়াশোন াকরেছেন। আর মহল্লার অধিকাংশই তো নিরক্ষর। হাঁড়ির প্রথম খাবার তোলা থ াকত মাস্টার সাহেবের জন্যে। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার ব্যবস্থা ছিল তখন আদিম। সে - কারণে প্রাতঃকৃত্যাদি সারার প্রথম অধিকার ছিল মাস্টার সাহেবের।
এই মাস্টার সাহেবদের অনেকের জায়গির থাকার পরও পড়াশোনা চালাবার সামর্থ্য ছিল না। তখন অনেক ক্ষেত্রে, এর সমাধানের জন্যে গৃহকর্তারা এরকম অনেককে জামাই করে নিয়েছিলেন।
দু - দশকের মধ্যে এবং পাকিস্তান হওয়ার পরপর এই মাস্টার সাহেবরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন ছোটবড় আমলা হিসেবে। এবং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তারাই হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা।
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাস্টার সাহেবরা অনেকে পুরনো স্ত্রী ত্যাগ করলেন ‘সমাজে খাপ খায় না’ দেখে। তারপর ঢাকা শহরে তাদের বাড়ির দরকার হলো। কিন্তু জমি তো সব আদি আধিবাসীদের। নাছির আহমদের মতে, তারা ঢাকার বিভিন্ন জমি একোয়ার শু করলেন। নতুন রাজধানীর জন্যে জমির দরকার ছিল বটে, কিন্তু নাছির আহমেদের যুক্তি একেব ারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধানমন্ডি, কলাবাগান, গ্রিনরোড প্রভৃতি এলাকায় নতুন চাকরিজীবীদের যে - আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল, তা আদি আধিবাসীদের উৎখাত করেই। অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণ করে আমলারা সেগুলি আবাসিক এলাকার জন্য চিহিত করে নামমাত্র দরে কিনে নিয়েছিলেন। যাদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশের টাকা আর দেওয়া হয়নি। এবং নতুনভাবে ‘এলটমেন্ট’ করার সময় এমন ব্যবস্থা করা হলো যাতে কুট্টিরা নতুন এলাকায় জায়গা না পান।
জনাব নাছির জানিয়েছেন, ধানমন্ডি, গ্রনরোড মার্কেট, সোনারগাঁও হোটেলের সামনে জমিগুলিও ছিল বিভিন্ন সর্দারের। আলাউদ্দিন সর্দারের জমি ছিল ছয়শো বিঘা। খুবসম্ভব কলাবাগান এলাকাটা ছিল তার। ওই সময়ে এটি ছিল জঙ্গল এবং এলাকাটির দেখাশোনা করতেন তাঁর লাঠিয়াল ও গোয়ালা বশীদ্দীন (যার নামে বশীদ্দীন রোড)। আলাউদ্দিনের ছয়শো বিঘার অধিকাংশই অধিগ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল। অধিগ্রহণ করা জমির প্রতি একরের জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছিল চারশো টাকা। এবং সেসব ক্ষতিপূরণের টাকা এখনো পাওয়া যায়নি। নতুন এই চাকরিজীবীশ্রেণি নিজেদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আদি অধিবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। (যে - কারণে চল্লিশ - পঞ্চাশের দশকে দেখি, ঢাকার কুট্টিরা নতুন এই শ্রেণিকে (ছাত্রসহ) সুনজরে দেখেনি)। নাছির আহমদের ভাষায়, “হাঁড়ির প্রথম দানাটা মুরগির রানটা বরাদ্দ ছিল মাস্টার সাহেবের জন্য। সেই মাস্টার সাহেব ডিপুটি হইয়া কোড়া মারলেন ত াদের, কইলেন, এরা হইল কুট্টি বর্বর আর মাস্টার সাহেবরা আলাদা।”৫৩
এ-ধরনের খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন কামদ্দিন আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে। লিখেছেন তিনি -- “পাকিস্তান হবার পরে ব াস্তুহারাদের চাপে ও অন্যান্য জেলা থেকে স্থায়ীবাসিন্দারা ধীরে ধীরে শহরে এসে জমা হওয়ার তারা হারিয়ে গেছে। আম ার মনে হয় আয়ুব মোমেন সরকার দ্বারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ছিদ্দিক বাজারের মতি সর্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুগের অবসান হয়ে গেছে।”৫৪
শুধু যে সর্দারদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা নয়। অনেক মাঝারি, ক্ষুদ্র কৃষকও তাদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়ে বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ডিওএইচএসের গড়ে - ওঠা আরো চমকপ্রদ। যেহেতু, পাকিস্তান আমলে ষাটের দশক থেকে এবং বাংলাদেশ আমলে সত্তরের দশক থেকে তারা আধিপত্যকারী ছিল। সুতরাং, এসব জমি নিয়ে উন্নত করে সামান্য টাকায় নিজেদের মধ্যে বিলি করেছেন।

বাংলাদেশ আমলে এ - প্রত্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। রাষ্ট্রে সমাজে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে সামরিক - বেসামরিক আমলারা। এ সঙ্গে যুত্ত হয়েছে লুম্পেন রাজনীতিবিদ, ঋণখেলাপিরা। এই বর্গ জমিকে দেখেছে বিনিয়োগ হিসেবে। তারা গ্রামকে গ্রাম উৎ?খাত করেছে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সাহায্যে জমির উন্নয়ন করিয়ে কমদামে তা উচচবর্গের কাছে বিত্রি করেছে। এটি তাদের ভবিষ্যতের নিশ্চিত গ্যারান্টি। অন্যদিকে, এ প্রত্রিয়ায় গত তিন দশকে জমির মূল মালিকরা শুধু উৎখাতই নয় 'উন্নীত' জমিতে একটুকরো জমিও পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও। এ নিঃস্বরা, মাথা গোঁজার জন্যে মনে ত্রোধ আর হতাশা নিয়ে গড়ে তুলেছে বস্তির পর বস্তি। সমসাময়িক দুই কবির কবিতায় রয়েছে তাঁর চিত্ররূপ। আবদুস সাত্তার লিখেছেন---

পাল্টেনি ঢাকার নাম। এ নাম এখনো টিকে আছে,
তবে, হ্যাঁ, পড়েছে ঢাকা সততার ধারক - বাহক,
ফুলে, ফেঁপে কলাগাছ ক্ষমতায় ঠক - প্রতারক
সততা ঢেকেছে ওরা ধোঁকাবাজি মিথ্যার লেবাসে।"৫৫

বা, শামসুর রহমান--

এ শহর টুরিস্টের কাছে -- পাতে শীর্ণ হাত এখন তখন
এ শহর বালিকারা জামা পরে, নগ্ন - হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ।"৫৬

।। আট ।।

এ - প্রসঙ্গে আমি অধ্যাপক আহমদ কামালে 'ঢাকা এ কোন শহর, এর কার শহর?' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে চাই। ঢাকা নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেছেন তাঁরা যে একথাগুলি বলেননি তা নয়, তবে বিষয়টিকে তিনি সংহতরূপে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটি নতুন দলিল উপস্তাপবন করেছেন। পাকিস্তান হওয়ার পরপর পাকিস্তান সরকার কীভাবে ঢাকাকে নতুনভাবে, নতুন জাতীয়তাবাদের ধারায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের ভাষায় ---

"This City of Destiny has yet to be developed, Government has decided to build up the city on the basis of the latest principles of planning and two British architects and Chief Engineer of reputation associated with the construction of New Delhi are on the job… The city of Destiny must be clean… wider avenues and boulevards flanked by orderly architect controlled building will appear… As days roll by cockles street hydrants, hut and poor – busteas, silted tanks full of filth and lamp stands without lamp – there other oddities will be soon no more in the city which is looking ahead and in making a vigorous bid for well – deserved modernity rooted in tradition."57

এ - বর্ণনায়, ১৯৪৭ - এর ঢাকার জীর্ণ ম্লান চেহারাটা ভেসে ওঠে। যারা ক্ষমতা পেয়েছেন তারা স্বাভাবিকভাবেই এই জীর্ণ শহরে থাকতে চান না। তাদের কল্পনায় আছে সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন এক শহর। বস্তির কথা আছে বর্ণনায়, কিন্তু সে বস্তি কী হবে, ভাবনায়সেটি নেই। বরং, তখনই ভারতের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারা দুজন প্রকৌশলী এনেছেন যারা নতুন দিল্লি নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। এ - পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক কামাল মন্তব্য করেছেন, "রাষ্ট্রের যে জায়গা পায় না, তারও একটা ইতিহাস থাকে। এই 'নীরবতা' বা silence কিন্তু ক্ষমতার সূচক। যে জায়গা পেল না, যার কথা বলা হলো না সে আরেক ইতিহাসের বিষয়।... লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে City of Destiny- তে খেটে খাওয়া, বস্তির মানুষগুলো কিন্তু oddity-র অংশ। নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্ত উচচবর্গের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও পরিচছন্নতার জগতে তারা বেশ খানিকটা বেমানান। নতুন 'মহানগরীর' কোথায় তাদের অবস্থান সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।... পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের এ চেহারাটা ধরতে না পারলে পরবর্তী প্রতিবাদী আন্দোলন বোঝাও একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে।"৫৮

বিষয়টি ঢাকাৰ উঠতি মধ্যবিত্তের চোখ এড়ায়নি। এ - পরিপ্রেক্ষিতে, অধ্যাপক কামাল আরেকটি দলিলের উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মুসলিম লীগ কর্মীশিবিরের একটি পুস্তিকা; নাম - পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা জনসাধারণ। প্রকাশক শেখ মুজিবুর রহমান ও নাঈমউদ্দীন আহমদ। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল -- "আমাদের মন্ত্রীমন্ডলী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী গঠনে কী করেছেন? কেন্দ্রীয় পাকিস্তান গভর্নমেন্ট সিন্দুর মতো জায়গায় সুনিয়ন্ত্রিত রাজধানী

গঠনের কাজে যদি অনেক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন তবে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী গঠনে মন দিতে পারছেন না কেন?"৫৯

না, মন্ত্রীমণ্ডলী মন দেননি, সে - ফল তাদের ভোগ করতে হয়েছিল। যারা ছিল ঢাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের নিয়ে ভাবার না কারণে এ - শহরে ক্রমেই পরিণত হচ্ছিল প্রতিবাদের শহরে। নতুন এক জাতীয়তার জন্মও হচ্ছিল, যার মূল বিষয় ছিল অধিকারবোধ।পাকিস্তান হওয়ার পরপর যে - পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা কার্যকর হয়নি। সেই ক্ষোভ প্রশমনে, ষাটের দশকে আইয়ুব খান স্থপতি লুইকানকে দায়িত্ব দেয় দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলার, যার নাম হয় বাঙালির প্রিয় নেতা এ কে ফজলুল হকের নামে শেরেবাংলা নগর। আবারো উৎখাত হয় গ্রাম, আদি বাসিন্দারা, যাদের খবর কেউ রাখেনি। তারা মিশে যায় আমাদের অলক্ষে নিঃস্ব মানুষের ভিড়ে, বস্তিতে বস্তিতে।

স্বাধীনতার পরও বিভিন্নভাবে শাসকরা ঢাকাতে গড়তে চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু ঘোড়দৌড়ের মাঠকে শুধু ঘিরে ফেলেন নারকেল গাছে, যা ছিল গ্রামবাংলার প্রতীক। গ্রামবাংলাকে তাঁর মনে ছিল। কিন্তু, গ্রামবাংলার মানুষ যারা ভিড় করছিল ঢাকায় নতুন দিনের প্রত্যাশায় তাদের নিয়ে যাওয়া হলো ডেমরার চরে, টঙ্গী, ভাসানটেকে। শহর আপাতত 'পরিচ্ছন্ন' হলো বটে, কিন্তু শহরের প্রান্ত ভরে উঠল প্রান্তিক মানুষে। অথচ, আধুনিক শহরে হয় উলটোটা। জিয়াউর রহমান পুরনো ঢাকার বৃক্ষরাজি কর্তন করে ঢাকাকে আধুনিক করতচাইলেন। সামরিক বোধে হয়তো শুধু কনক্রিটই সুন্দর, যাতে সাদা চুনকাম করা যায়, 'পরিচ্ছন্ন' দেখায়। এরশাদ বড় বড় কিছু রাস্তা গড়লেন, সুন্দর বাংলা নাম দিলেন। সবাই কসমেটিক প্রলেপের কথাই ভাবলেন। কিন্তু গরিব মানুষের ভিড় আটকান গেল না। ঢাকা আবার উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠল বটে, যে কারণে গ্রামের মানুষরা শহরমুখী হলেন। কিন্তু এ - উৎপাদন হলো গার্মেন্টস, যেখানে মানুষ শুধু ক্রীতদাস। সেই মুঘল আমলের মতো, ঢাকা বিখ্যাত হয়ে উঠল গার্মেন্টসের জন্য, কিন্তু উৎপাদক ছিল নিরন্ন ক্রীতদাস। গার্মেন্টস বিত্তহীন নারীদের শ্রমবিক্রির স্বাধীনতাটুকু মাত্র প্রদান করল। নদীভাঙা মানুষ, ভূমিহীন মানুষ ভিড় জমাতে লাগলেন। রিকশা হয়ে উঠল তাদের জীবিকার বাহন। ঢাকা একসময় হয়ে উঠল রিকশার শহরে, বাগানের শহর হয়ে গেল ইতিহাস।

ওই সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো দখল। এই প্রক্রিয়া ১৯৪৭ থেকেই শু হয়েছিল, স্বাধীনতার পর যা হয়ে উঠল আমাদের মৌল বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তান হওয়ার পর দখল হয়েছে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, কৃষিজমি। ১৯৭১ -এর পর অবাঙালি ও যোগসাজশকারীদের। তারপর দখল হতো লাগল শহরের জমি। একসময়ের ডিআইটিকে (রাজউক) দেওয়া হয়েছিল সুন্দর ঢাকা তৈরির পরিকল্পনা। তারা এই দখল - প্রক্রিয়ার সহযোগী হয়ে উঠল। সরকারি প্রক্রিয়ায় যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান ঢাকার আবাসিক এলাকারস্থাপত্য বিশ্লেষণ করলে এই দখলের চরিত্রটি স্পষ্ট হবে। গুলশান, বিশেষ করে বারিধারায় স্থাপত্যে এই চরিত্রটি অনেকাংশে ফুটে উঠেছে।

প্রতিটি সরকার ঢাকাকে ঘিরে একেকটি পরিকল্পনার কথা বলেছে। বিভিন্ন সময় মাস্টারপ্ল্যান, এমনকী মহাপরিকল্পনাও প্রণীত হয়েছে, কিন্তু কিছুই কার্যকর হয়নি দখলি মনোভাবের জন্য। একটি শহরের বড় আকর্ষণ সাংস্কৃতিক ও বিনোদন - ব্যবস্থা। দখলিপ্রক্রিয়ায় ঢাকার ইতিহাস - ঐতিহ্যের প্রতীকগুলো বিনষ্ট হয়েছে। কোনো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই গড়ে ওঠেনি। বিনোদনের কোনো বন্দোবস্ত এ - শহরে নেই, যা আছে, তা উচচবর্গের জন্যে। নিম্নবর্গের জন্যে রাখা পার্কগুলো দখল হয়ে গেছে। জলাশয় রক্ষার আইন করলেও তা কার্যকর হয়নি। ঢাকার ক্যানাল ও জলাশয়গুলো দখল হয়ে গেছে। ঢাকার গড়ন ছিল এমন যে, শহরটা ঢালু হয়ে নদীর দিকে গেছে। যার ফলে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে যেত নদীতে। শহরময় ক্যানালগুলো ছিল জল - নিঃসারক। এখন সেসব পথ দ্ধ। ফলে, বর্ষার ঢাকা হয়ে পড়ে অচল আর এর সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে ওঠে দুঃসহ। অন্যদিকে, এই দরিদ্ররাই কিন্তু শহরের অর্থনীতি রেখেছে সচল। দখল - প্রক্রিয়া এমন হয়েছে যে, শহর চালু রাখার জন্য কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ জায়গা দরকার রাস্তার জন্য অথচ সেক্ষেত্রে ঢাকায় রাস্তাঘাটের জন্য আছে সাত - আট ভাগ।

ঢাকার লোকসংখ্যা আজ এক কোটির ওপর। শহরে আছে ৪৫০০ বস্তি। পিডাপের মতে, এক কোটি লোকের ৬০ ভাগ দরিদ্র এবং ৪০ ভাগ হতদরিদ্র। এদের মধ্যে ৪০ লাখ পরিবার বস্তিবাসী। ৭৫ ভাগ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে ভাড়াটে হিসেবে এবং ২৫ ভাগ সরকারি জমিতে ঝুপড়িতে, পানি, পয়ঃনিষ্কাষণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি মৌলিক সেবাবিবর্জিত অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে, যা কোনো সভ্যদেশের জন্যে দুঃখজনক।৬১ বাকি যারা বস্তিতে বাস করে না, তাদের

অর্ধেকের মাথার ওপর ছাদ থাকলেও জীবন স্বচ্ছন্দ নয়।

ঢাকা শহরে নিয়ন্ত্রণ করছে বা দখলি - প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখছে উচ্চবর্গের ১০ থেকে ২০ ভাগ। এদের আবার ক্ষমতায় বসাবার জন্য বিভিন্ন হতদরিদ্র সবসময় প্রাণ দিয়েছেন। ১৯৫২ থেকে এ - পর্যন্ত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ - শহরে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের পাঁচ ভাগও উচ্চবর্গের নয়। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম কার্ফু ভেঙে আত্ম াহুতি দিয়েছিল নীলক্ষেত বস্তির মানুষরা। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের প্রথম ঝাপটাটা তাদের ওপর দিয়েই গেছে। বেলাল চৌধুরী যেমন লিখেছিলেন --

"সাল ৭১, ২৫শে মার্চের রাতে বর্বর হানাদার বাহিনী যখন ঝাঁপিয়েছিল আচমকা নিরীহ জনতার ওপর -- তার প্রথম ঝ াপটা কিন্তু এসে লেগেছিল এই রিকশাচালক আর তার আরোহীদের ওপর"; ৬২ কিন্তু গরিবের শহর ঢাকা সবসময় প্রস্তুত ছিল, আছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য। বারবার আশ্বাস পেয়েও আশা পূরণ হয়নি, কিন্তু, তবুও গরিবরা প্রথমে এসে রাজপথ আর পল্টন ভরে তোলে। ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনের আশা জাগায়। যেমন লিখেছিলেন কবি মাহবুব ত ালুকদার---

আমার শহর ঢাকা নতুন দিনের চেতনায় উদ্দীপ্ত
বায়ান্নোর শহীদের রক্তধারায় রঞ্জিত এর রাজপথ
উনসত্তরের দৃপ্ত শ্লোগানে মুখরিত আমাদের শার্টের উজ্জ্বল পতাকা
জনতার জোয়ারে জাগরিত শপথ দুর্বার শ্বাস ছড়ায়।
একাত্তরের বাদের পোড়া গন্ধ রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ
রাইফেলের বাট তখন পিতামহের হাতের যস্টির মত
কৃষক শ্রমিক ছাত্র স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে কি দুর্জয় সৈনিক হয়ে যায়
প্রতিরাতে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ বুকে নিয়ে এ শহর গান গেয়ে ওঠে
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

আগেই বলেছি, ঢাকার গরিবদের সবসময় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে মোটা ভাত কাপড়, বাসস্থান, গণতন্ত্র আর সাম্যের বা বেঁচে থাকার অধিকারের। যারা আশা দিয়েছেন তারাই একসময় অন্তর্গত হয়ে গেছেন এস্টাবলিশমেন্টের। যথার্থই লিখেছেন আহমেদ কামাল, 'এভাবে ক্ষমতা কাঠামোর অভ্যন্তর আত্মস্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার জন্য এ যাবৎকাল আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি অনেকখানি নাকচ হয়ে যায় আর অন্যরা যারা ক্ষমতাকাঠামোয় স্থ ান করে নিতে পারে না, তারা জাতীয় রাজনীতিতেলক্ষ্যহীন, "সেই পরাজয়ের অভিজ্ঞতায় বারবার নিরীক্ষা করার মধ্যেই আগাম বিজয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে।"৬৩

মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে বটে, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যায়, সে আশা তো পূরণ হয় না। এ - কারণেই বোধহয় প্রয় াত কবি হুমায়ুন আজাদ ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন---

তুমি ভাবছো ঢাকার পথে পথে নাচছে তোমার ভবিষ্যৎ
তুমি ভাবছো ঢাকার আকাশে উড়ছে তোমার স্বপ্ন
তুমি ভাবছো ঢাকার মিনারে মিনারে বাজছে তোমার জীবন ...
তুমি জানো না ঢাকা এখন নেকড়ে থেকেও হিংস
তুমি জানো না ঢাকা এখন কর্কট রোগের থেকেও
অচিকিৎস্য...৬৪

যে - শহরে অধিকাংশ দরিদ্র সে - শহরে অস্তিমে সংঘর্ষ অনিবার্য। যারা ঢাকা দখল করে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ নিশ্চিত বলে মনে করছেন, সে - বিনিয়োগ নিশ্চিত নাও থাকতে পারে। কারণ, শহরটি ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে। একটি শহরকে শহর বলা যায় তখনই যখন এর সব বাসিন্দা কমবেশি পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতরিত সুযোগ - সুবিধা ভোগ করেন। এ - শহরে, শুধু সেই ৬০ ভাগই নন, ৮০ ভাগই সে - সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারপর নেই কোনো সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ বা বিনোদন, যা

সবার জন্য উন্মুক্ত। ৬০ ভাগ লোকের বেঁচেবর্তে থাকাটাই অনিশ্চিত। তাই, এ - শহরে সবসময় এক ধরনের দ্বন্দ্ব, ক্রোধ বা সংঘাত বিরাজ করবে। মুঘল আমলের বাগানের শহর এখন আন্দোলন আর রিকশার শহর। এই দুই প্রতীকই বলে দেয় শহরের হাল। বাগানের শহর থাকার সময় হয়তো শহরটি ছিল দৃষ্টিনন্দন, কিন্তু মানুষ ছিল দরিদ্র। আজ সেই শহরের একই অবস্থা, সংখ্যাগরিষ্ঠ হতদরিদ্র এবং শহরটিও আর দৃষ্টিনন্দন নয়। তাই ভাবি ৪০০ বছরে মৌলিক কী পরিণতি হলো আমাদের?

।। তথ্যপঞ্জি ।।

১। আমি এখানে এক দশক আগের পরিসংখ্যা ব্যবহার করছি। প্যাটার্ন করলে, পরিসংখ্যানের সংখ্যার হেরফের হতে প ারে, কিন্তু প্যাটার্ন একইরকম হয়ে গেছে। ১৯৮৭ সালের এক হিসাবে জানা যায়, মাসিক ১০০০ থেকে ৩০০০ টাকা য ারা রোজগার করে তাদের সংখ্যা ৭০ ভাগ। মধ্য আয় ২৮ ভাগ (৩ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা), মাত্র দুভাগ উচচবিত্তের। ১৯৮৮ সালে বস্তির সংখ্যা ছিল ১১২৫, আয়তন ১৩৮০ একর, বাড়ির সংখ্যা ১,৪৬,৪০০ ও মানুষের সংখ্যা ১০,১০,০০০ জন। পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক নজল ইসলামের কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে, যা সংকলিত হয়েছে -- Nazrul Islam, Dhaka, From City to Megacity, Urban Studies Programme, University of Dhaka, Dhaka, 1996

২। অনেকের মতো ঢাকার পত্তন হয়েছিল ১৬০৮ সালে। অধ্যাপক আবদুল করিম বিভিন্ন বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ইসলাম খান ১৬১০ সালে পদার্পণ করেছিলেন ঢাক্য। তাঁর যুক্তিটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন Abdul karim, Dhaka : The Mughal Capital, Dhaka City Museum, Dhaka, 1996.

৩। ঐ

৪। Asadul Huq, Process of Urbanization of Bangladesh (M.A. Thesis, Brown University, U.S.A (1977).

৫। F. Karim Khan and Nazarul Islam, 'High – class Residential Areas in Dacca City', The Oriental Geographer, Vol III, No. – 1, 1964, p 4. প্রবন্ধে তাঁরা অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ঢাকার জনসংখ্যার যে - হিসাব দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি --

বৎসর ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা উৎস

১৭০০ ৯০০,০০০ জেমস টেইলর ১৮০০ ২০০,০০০ জেমস টেইলর

১৫১৪ ২০০,০০০ ডালিয়া

১৮২৪ ৩০০,০০০ বিশপ হেবার

১৮৩৮ ৬৮,৩৩৮ বিশপ হেবার

১৮৬৭ ৬১,৬৩৫ রেনেল

১৮৭২ ৬৯,২১২ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৮৮১ ৮০,৩৫৮ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৮৯১ ৮৩,৩৫৮ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৯০১ ১০৪,৩৮৫ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৯১১ ১২৫১,৭৩৩ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৯২১ ১৩৭,৯০৮ সেন্সাস অব পাকিস্তান ১৯৩১ ১৬১,৯২২ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৯৪১ ২৩৯,৭২৮ সেন্সাস অব পাকিস্তান

১৯৫১ ৩৩৫,৯২৮ সেন্সাস অব পাকিস্তান ১৯৬১ ৫৬০,১৪৩ ঐ, ১৯৬১

১৮৩৮ সাল থেকে হিসাব মোটমুটি ঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৬। এ - বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে দুটি গ্রন্থে - F. D. Ascoli, Final Report on the Survey and

Settlement Operation in the Dacca District. 1917. M. M. Das. Dacca Lakheroj Land, Dacca. 1912.

৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, আবদুল করিম ঢাকার মসলিম, ঢাকা ১৯৯০।

৮। Reginald Heber, A Narrative of Journey through the Upper Provinces of India. From Calcutta to Bombay, 1824-1825 (with Notes upon Ceylon), London, 1826.

৯। প্রাগুক্ত

১০। প্রাগুক্ত

১১। প্রাগুক্ত

১২। প্রাগুক্ত

১৩। ১৮৩৮ সালে ২৯ আগস্ট কমিশনার বোর্ডকে যে - চিঠি লিখেছিলেন তাতে লিখেছিলেন --

"That any such lands said to be portions of the various malguzari estates noted below were included in the city, on which have been erected all sorts of dwelling houses, shops, bazaars Etc. With Exception of these, I believe the main portion is lakhiraj and that I did not ever estimate it as comprising there fourth of the whole, the incumbents of which at a guess from to 10 to 15rest their claim upon sanads the offers an uninterrupted possession which they have obtained by inheritance from their ancestors or by purchase from those of the original setter."

১৮০৭ সালে ঢাকার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর কমিশনারকে জানান, এ - পর্যন্ত লাখেরাজ জমির মালিকরা কাউকে কোনো খাজনা দেয়নি এবং এই জমির গড় পরিমাণ ছিল দুই থেকে দশ বিঘা। বাড়তি তথ্যের জন্য দেখুন, এসকলির রিপোর্ট।

১৪। মুঘল আমলের স্মৃতি বহন করছে এখনো হাজারীবাগ, লালবাগ প্রভৃতি।

১৫। James Taylor, Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Calcutta, 1840.

১৬। ঐ, পৃ ৫৯।

১৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৯৬৯।

১৮। ঐ, ১৮৩৪।

১৯। রাধারমণ শীল, 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিষয় কবিতা', রবিউল হুসাইন - সম্পাদিত কবিতায় ঢাকা, ঢাকা, ১৯৯৬।

২০। "Anthony King has shown how the British ensured a physical separation between the life of the official elite and that of the Indian people by planning Civil stations adjoining but apart from Indian towns. There they lived in an ordered environment. In spacious houses enclosed by large gardens and fenced by wide, straight rods. India towns with their congested, winding street, seemed a different world mysterious and sometimes threatening. A similar seclusion as provided for them in cantonment as permanent military camps." Kenneth Ballhatchet, Race, Sex and Class under the Raj, London, 1980,

২১। "Yet Calcutta, Bombay and Madras were bustling modern cities and it was sometimes difficult to maintain prestige of the ruling races. There was no room for spacious civilizations cantonments. These great cites were also seen to contain many Europeans of the lower also seen to contain many Europeans of the lower classes and this circumstances or sometimes led problems that perplexed the authorities.'

২২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য Sharifuddin Ahmed, Dacca, London. 1986.

২৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুতাসীর মানুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, ঢাকা, ১৯৮৬।

২৪। ওই পত্রিকার রিপোর্ট - অনুসারে প্রায় শহর - সংলগ্ন কায়েতটুলিও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে, শহরের অবস্থা কী ছিল সহজেই অনুমেয়। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৩।

২৫। ঐ

২৬। From Assistant surgeon H.C. Cutcliffe, F.R.C.S Officiating Civil Surgeon of Dacca to the

Chaiman of the Municipal Commissioners of Dacca, No – 106. Dated, Dacca 7. 4. 1869. Proceedings of the Lt. Governor of Bengal. Judicial Dept. 1869.
২৭। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৪।
২৮। দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৯।
২৯। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৮২।
৩০। কুশাই সরকার, নানাবিধ গান, ঢাকা, ১৮৯২।
৩১। Proceedings of he Lt Governor of Bengal, Judicial Dept, 1869.
৩২। নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সজনীকান্ত দাস - সম্পাদিত, কলাকাতা, ১৩৬৬,
৩৩। Proceeding, 1869.
৩৪। নবীনজন্দ্র সেন পূর্বোত্ত।
৩৫। Azimusshan Haider (ed) A city and its Civic Body, Dhaka, 1966
৩৬। A. H. Dani, Dacca, A Record of its Changing Fortunes. Dacca, 1962,
৩৭। James Tayor. Op, cit.
৩৮। Proceedings. 1869.
৩৯। Proceeding of Governor of Bengal, Judicial Dept. 1871.
৪০। গ্রাহাম কমিশনারকে জানান যে, চালকরা অধিকাংশই ছেলে - ছোকরা এবং তারা উচছৃঙ্খলভাবে গাড়ি চালায়। ফলে জনাকীর্ণ রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তিনি জানান, রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্ত করলে চালকদের উচছৃখলতা কমবে।
৪১। ঢাকা প্রকাশ, ১৮৮০।
৪২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন Nazia Hussain, ‘The Municipality in British dacca’ Bangladesh past and Present. London, 1971.
৪৩। Henry walters, ‘Census at the City of dacca’, Asiatic Researches, 1837
৪৪। ঢাকা প্রকাশক, ১৮৮০।
৪৫। ভবতোষ দত্ত, আট দশক, কলকাতা। এ প্রসঙ্গে ১৯১৭ সালে প্যাট্রিক গেড্ডেস লিখেছিলেন --
‘This excellent suburb of once proves the demand for houses of the Bungalow type and the possibility of planning them in Dacca. In this prosperous and desired and also extend it survey throughout the month east quarter. This is partly filling up with wealthy homes partly with homes of the village type.’
Patrick Geddes, Report on town Planning – Dacca, Calcutta. 1971.
৪৬। মুনতাসীর মামুন, হৃদয় নাথের ঢাকা শহর, ঢাকা।
৪৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য মুনতাসীর মামুন, সিভিলিয়নের চোখে ঢাকা, ঢাকা ২০০৩
৪৮। বিস্তারিত বিবরণৰ জন্য প্যাট্রিক গেড্ডেস, ঢাকা, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯১৭ (অনুবাদ ও ভূমিকা আবদুল মোহাইমেন), ঢাকা, ১৯৯০।
৪৯। ঐ।
৫০। নর্থ ফিল্ড, ‘ঢাকা শহর’ (অনুবাদ রবিউল হুসাইই), রবিউল হুসাইন - সম্পাদিত, কবিতায় ঢাকা, ঢাকা, ১৯৯৬,। কবিতাটি ১৯৩০ - ৪০ - এর মধ্যে রচিজত।
৫১। মুনতাসীর মামুন, ‘ঢাকার পঞ্চায়েত’, স্মৃতিময় ঢাকা, ঢাকা, ১৯৮৯।
৫২। বিস্তারিত বিররণের জন্য কামদ্দীন আহমদ, বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ঢাকা।
৫৩। আবদুস সাত্তার, ‘ঢাকার কবিতা’, কবিতায় ঢাকা।
৫৪। শামসুর রহমন, ‘এ শহর’, ঐ।
৫৫। আহমেদ কামাল, ‘ঢাকা এ কোন শহর’ ঢাকা শহর, ঢাকা, (নাজমা জেসমিন স্মারক বত্তৃতা) ২০০৫।

৫৬। ঐ।
৫৭। ঐ।
৫৮। প্রচারপত্র, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর, ঢাকা, ২০০৫।
৫৯। বেলাল চৌধুরী, ‘বিকশার শহর ঢাকা’, কবিতায় ঢাকা।
৬০। মাহবুব তালুকদার, ‘আমার শহর ঢাকা,’ কবিতায় ঢাকা।
৬১। আহমেদ কামাল, প্রাগুক্ত।
৬২। হুমায়ুন আজাদ, ‘ঢাকা ঢুকতে তোমাকে যা যা অভ্যর্থনা জানাবে’, কবিতায় ঢাকা।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com